বঙ্গসাহিত্যে ব্যক্তিবোধ ও রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষ

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সুসংবাদ এ সাহিত্য ক্রমশ সমাজ-চেতনায় মুখর হয়ে উঠেচে। গতমন্বন্তরের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে এই লক্ষণটি অতিসুস্পষ্ট হয়ে উঠেচে আরো বেশি করে। তারাশঙ্কর, নারায়ণগঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণ এসম্বন্ধে পথপ্রদর্শক। তাঁদের বৈশিষ্ট্য একদিন বাংলা সাহিত্যেরইতিহাসে পৃথক অধ্যায় সৃষ্টি করবে। এই সমাজচেতনাব্যক্তিবোধের সঙ্গে বিরোধিতা করেনি, বরং তাকে আরোবাস্তব ও আরো সক্রিয় করে তুলতে চেয়েচে। সেই সমাজবোধঅনিষ্টকর যা কিনা মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাপনের দাবি নিয়েব্যক্তিবোধকে ক্ষুণ্ন করে। সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কথা এইব্যক্তিবোধ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ইতিহাসের সবচেয়েবড় প্রশ্ন।

মানুষ নিয়ে ইতিহাস, মানুষ নিয়েই সাহিত্য। আশা ওনিরাশার অনুভূতিতে সদাচঞ্চল কতকগুলি মানুষ নিয়েইযেমন সমাজ, তাদের প্রত্যেকের অনুভূতির চরিতার্থতা দিয়েইসমাজবোধের সার্থকতা। চরিতার্থ ব্যক্তিবোধের সমষ্টিতেইসার্থক সমাজ গড়ে ওঠে। অতএব ব্যক্তিবোধ সাহিত্যে অবান্তরনয়, মূল উপাদান। মানুষ আকাশে বাস করে না, সমাজে বাস করে; তাইনভোচারী সাহিত্য তাকে স্বপ্নালু করে তুলতে পারে, জীবনযাপনের সমস্যাসমূহের সমাধানে সাহায্য করতে পারে না।

বাংলাদেশ যখন এত বড় মন্বন্তরের সম্মুখীন হল, তখন বাংলার রসস্রষ্টা সাহিত্যিকদের মনে তা যথেষ্ট বেদনা ও অবেগের সৃষ্টি করে গেল। তাঁরা প্রথম চোখ মেলে চেয়েদেখবার সুযোগ পেলেন। কল্পনার রসবিলাস নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে তা আজ নিতান্ত অসার বলে পরিগণিত হবেজাতির উগ্র বেদনাবোধের সম্মুখে। জাতিকে তা সাহায্য করবেনা। পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না। দেশকে জাগাতে হবে।মন্বন্তরের করাল ধ্বংসলীলার মধ্যেও বহু নরনারীকে দিব্য আরামে সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজভোগ খেয়ে মোটর চারী বিলাসব্যসনের পঙ্কে নিমজ্জিত থাকতে দেখে তাঁরা বুঝলেন, দেশ সজাগ হয়নি। তাঁরা ঘুম ভাঙানোর ভার নিয়েছিলেন।প্রবোধের 'অঙ্গার' মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি সেই ঘুম ভাঙানোর গান। ঘুম ভাঙলো কিনা জানি না, কিন্তু লজ্জিতহল অনেকে।

আজও অনেকে অভিযোগ করেন, বাংলা সাহিত্যে এখনো সমাজবোধ, রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রভৃতি অঙ্কুর অবস্থায়মাটি থেকে উঁকি মারচে মাত্র। এত বড় আগস্ট আন্দোলন জাতীয় অন্দোলন এতটুকু দোলা দেয়নি কথা-সাহিত্যিকদের মনে। কোথায় এই বিপ্লবের সাহিত্য, যা দেশকে বল দেবে, দেশবাসীর মনে আশা ও উৎসাহ আনবে, পথ দেখিয়ে দেবে !দু-একজন উন্নাসিক সমালোচক এ নিয়ে সাময়িক পত্রে শুধু অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হন নি, বাংলা সাহিত্যিকদের ক্ষমতারইঙ্গিতও করেচেন।

বাংলার সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর দেওয়ার আবশ্যক নেই। লেখা আসে কবিমানসেরঅন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। কবি-মানসের বিভিন্নমুখী গতি থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখার সৃষ্টি। যেদিন বাংলার লেখকরা দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, সেই প্রসারিতচেতনাই তাদের বাধ্য করবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সমাজসমস্যাকে আশ্রয় করে গল্প ও উপন্যাস লিখতে। এই ব্যাপকচেতনার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেচে বহু শক্তিশালীলেখকের সাম্প্রতিক রচনায়। আমরা পেয়েছি দুর্ভিক্ষ, পেয়েছিআগস্ট আন্দোলন। একটি জীবন্ত সাহিত্যবিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলি ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখে দিচ্চে। বহু লেখার আবশ্যক কি ?একখানি সার্থকরচনায় এক-এক যুগকে অমর করে রাখে যেমন সোভিয়েটরাশিয়ার দুঃখ-দুর্দশার

চিত্র ফুটে উঠেচে ওয়েলেস্কির 'দিরেনবো' নামক উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্যে দিয়েভারতব্যাপী বিরাট রাষ্ট্র আন্দোলনের চিত্রকে অমর করে রেখেগেলেন। এঁদের প্রতিভা ঐ সব রচনাকে অপূর্ব আঙ্গিকের মধ্যেদিয়ে যুগ-প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উন্নীত করে দিয়েচে। গণ-চেতনাযে কিভাবে অমর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তার খোঁজ নিতেগেলে ওগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের মাপকাঠি হচ্চে তার রসোত্তীর্ণতা। যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে জীর্ণ পুঁথির পাতার মতো অবহেলিতহয় যে রচনা, মানব-মনের প্রয়োজন-সাম্য যা বজায় রাখতে পারে না, তার দুর্গতির কারণই হচ্চে রসোত্তীর্ণতার অভাব।ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই বিষয়টি রসোত্তীর্ণ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই। নিজের ব্যথাবোধ ও নিপীড়িত চেতনা কবিমানসকে যে রচনায় উদ্বুদ্ধ করেতার প্রতি ছত্রে ফুটে ওঠে অনুভূতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আজ যে ব্ল্যাকমার্কেট, যে অসংযত অর্থলোলুপতা, যে বস্ত্রদৈন্য, অন্নকষ্টদেশব্যাপী হয়ে উঠেচে তাতে নিছক কল্পনাবিলাসের সাহিত্যএখন অসার বলে পরিগণিত হবেই, সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের মধ্যে ফুটে উঠচে নবচেতনা দৃষ্টিভঙ্গির নবীনতা, দৃঢ় ও ব্যাপকসমাজচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট আদর্শ। এসব যেএখনো দানা বাঁধেনি, এ খুব সত্য কথা। নূতন পরিপাক করতে সময় লাগে। সাহিত্য সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভের রচনানয় বা রাজনৈতিক প্রচারপত্র নয়, মনের দিক থেকে সত্য ওবাস্তব না হয়ে উঠলে লেখকের হাত দিয়ে যে রচনা বেরোয়, তার রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না—সুতরাংলোকের হাততালি, বাহবা বা পরামর্শদাতাসমালোচকদেরবিজ্ঞ পরামর্শের প্রভাবে বা অতি আধুনিক যুগস্রষ্টা আখ্যায়ভূষিত হবার লোভে বা দুরাশায় যাঁরা এ পথে অগ্রসর হবেন, তাঁরা ঠকবেন। সাংবাদিকদের ধর্ম সাহিত্যিকের পক্ষে পরধর্ম, এটা তাঁরা জানেন এবং জানেন বলেই আজও আমরা বাংলাসাহিত্যে আশানুরূপ সন্ধান পাচ্চি না আধুনিক দিনের উগ্র সমস্যাগুলির। কিন্তু দিকচক্রবালে নব-বাহিনীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি দেখা দিয়েচে, ওদের শঙ্খধ্বনি দূর থেকে আমাদের কর্ণে এসে ধ্বনিত হচ্চে, ওরা আসচে, হতাশার কারণ নেই। বিজ্ঞসমালোচকদের দীর্ঘশ্বাস এবং কিছু হচ্চে না, কিছু হচ্চে না' ধ্বনির উত্তর এরা দেবে।

আর একটা বড় লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাহিত্যে।আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের গণ্ডী বাংলার শ্যাম গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েচে, বাংলার বাইরের বহু গ্রামদেশের পটভূমিকে আশ্রয় করে। বাংলার বেণুকুঞ্জ ও বৃহত্তর বাংলারঅরণ্য-পর্বত, মরুদেশ, কঙ্করময় রুক্ষ মালভূমি সবই তারসমান আদরের বস্তু। মানুষের মধ্যে যে লেখক, যে শিল্পীবাস করে, তার কাছে দেশ বা জাতের কোনো সীমানা নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় লক্ষণ এই যে, আজসে উদার মুক্তির ব্যাপ্ত নীলাকাশতলে এসে দাঁড়িয়েচে কি গল্পে, কি উপন্যাসে, কি কবিতায়। এ পথের খনিএ ধরে আগুয়ান হবেন যাঁরা, তাঁদের কত দল মরুপ্রান্তরে বেঘোরে মারা যাবেজানি, কত লোকের পাত্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবু তাদেরই কপালের ঘামে পথের ধুলো দেবে ভিজিয়ে, একটা সুনির্দিষ্ট পথরেখা ফুটে উঠবে ওঁদের গীতিপ্রাণ চরণক্ষেত্রের ধ্বনিরতালে তালে।

এই খনিত্রবাহিনী নতুন সাহিত্য রচনা করচে, যে কোনোমাসিকপত্র খুঁজে দেখলে এদের গল্প পাওয়া যাবে, কবিতা পাওয়া যাবে, উপন্যাস পাওয়া যাবে। বহু তিরস্কারের মধ্যেদিয়ে এদের সার্থকতা আসবে একদিন। বহু ব্যর্থতা এদের প্রাণশক্তিকে আরো দৃঢ়, আরো সংহত করে তুলবে। কিন্তুপরবর্তী ইতিহাস হয়তো এদের সম্বন্ধে নীরব থাকবে, জয়-বিজয়ের ইতিহাসে নাম থাকে সম্রাটদের, সেনাপতিদের, খনিত্রবাহিনীর লোকেদের নাম তাতে লেখা থাকে না। তাতে কি ?আমরা আজ এদের অভিনন্দন জানাই। এদেরক্রম-বিকাশের পারম্পর্য আজ আমাদের কাছে পরিস্ফুট নয়, কারণ আমরা এ যুগেরই অধিবাসী, এত নিকটে থেকে দেখতে গেলে অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেন্টকেনিছকবাজে আধুনিকতা বলে ভুল করার বিপদ আমাদের পদে পদে।

বাংলার উপন্যাসসাহিত্য সত্যই পেছনে পড়ে আছেঅন্য দেশের উপন্যাসের তুলনায়। মননশীল উপন্যাসের কথাবাদই দিলাম, কিন্তু শুধু ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই।যে ঘটনাপ্রধান উপন্যাস বহু আধুনিক সমালোচকের চক্ষুশূলএবং যে পর্যায়ে তারা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিফেলতেও দ্বিধা করেন না, সেই ঘটনাপ্রধান উপন্যাসেরক্ষেত্রেই বা টলস্টয়ের War and Peace বা ডস্টয়ভস্কির Brother Karamazov-এর মতো উপন্যাস কোথায় ?

অবশ্য একটা আশার কথা এখানে বলে রাখি। বৈদেশিকসাহিত্যেও আদর্শস্থানীয় মননপ্রধান উপন্যাসের সংখ্যাহাতে গুনে ঠিক করা যায়।গত মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপীয়সাহিত্যক্ষেত্রে ফরাসী লেখক ও সমালোচক জুলিয়ান বেন্দা এইমননপ্রধান কথাশিল্পের ক্ষেত্র তৈরি করেন, তার আন্দোলনকেতখন অনেকে সাময়িক হুজুগ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ এই শ্রেণীর উপন্যাস ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্রমশদেখা দিতে শুরু করেচে। যদিও একথা নিঃসন্দেহে বলাযায়, নামজাদা ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাবেকপন্থী। ওদেশের পাঠকমনেরও গ্রহিষ্ণুতার প্রসারতা যে আমাদের দেশের চেয়ে বেশি নয়, ব্রিটিশ সাহিত্যের দরবারেজেমস জয়েসের মতো খাঁটি মননপ্রধান লেখকের অভ্যর্থনালক্ষ্য করলেই সেটি অনুমিত হয়।

শরৎচন্দ্রের কিছু পূর্ব থেকে আমাদের সাহিত্যে একটাঅস্পষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। ব্যষ্টি সমষ্টির মুখ চেয়ে কেন নিজের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দেবে এই একটি কঠিনসমস্যামূলক প্রশ্নক্রমশ ঠেলেউঠছিলসাহিত্যে শরৎ-সাহিত্যে সেই ব্যষ্টিকেন্দ্রের সুর অতি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এইটিইআসলে শরৎ-সাহিত্যের মূল সুর। সহৃদয়তা ও মানবতাশরৎ-সাহিত্যের আর একটি সুর।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বইগুলির রচনা যখন প্রায় শেষ হয়েএসেচে তখন বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলন শুরু হল, এইআন্দোলনটি অতি উগ্রভাবের ব্যষ্টিকেন্দ্রিক। কালি-কলম' ছিল এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দিগের অন্যতম মুখপত্র।ব্যক্তিত্বের উদ্দাম সাধনাই এই সময়ের বহু গল্প ও কবিতারমূলতত্ত্ব। ঐ একই মূলতত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে নানা যৌন সমস্যাবাস্তব না কাল্পনিক, বিভিন্ন রঙে প্রতিফলিত হয়ে দেখা দিতেলাগলো পাঠকদের সামনে। এই আন্দোলন যথেষ্ট তিরস্কৃতহয়েছিল সে সময়, সেকথা সে যুগের পাঠকের অজ্ঞাত নয়, কিন্তু সেই নব আলোড়নের সংহত শক্তি বাংলায় একদল নতুনশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা তৈরি করেছিল। লেখকদের নব দৃষ্টিভঙ্গিঅলক্ষ্যে আশ্রয় করেছিল পাঠকদের। সাহিত্যের ইতিহাসেএকটি বড় সুলক্ষণ এই যে নব আন্দোলনের লেখকেরা গ্রহিষ্ণু পাঠকদল সৃষ্টি করেন যাদের রসবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বযুগের পাঠক-সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক অগ্রসর।

শরৎপূর্ব বা রবীন্দ্রপূর্ব যুগের উপন্যাস বর্তমানের অতিতরুণ পাঠক-পাঠিকার কাছেও জোলো এবং ফিকে ঠেকবে।বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবিশ্যি এ পর্যায়ে পড়ে না—তিনি ছিলেন যুগপ্রবর্তক আচার্য, তার অসামান্য প্রতিভা সাধারণলেখকদিগের দুরধিগম্য, তাঁর দুঃসাহসিকতা এখনো পর্যন্তবাঙ্গলার লেখকদের নিকট আদর্শস্থানীয় হয়ে আছে এবংচিরকাল থাকবে।

কবি বা শিল্পী মানসের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থেকে রসসৃষ্টিসম্ভব হয়। এ বিষয়ে শিল্পীর স্বাধীনতা অনস্বীকার্য। অন্তর্নিহিতপ্রেরণা ভিন্ন শিল্পী কখনো অগ্রসর হবেন না। বাইরের লোকের তাগিদে বা বিরুদ্ধ সমালোচকের ভয়ে বা সস্তা হাততালিপাওয়ার লোভেঅতি আধুনিক হওয়ার যে চেষ্টা লেখকের পক্ষেতা মৃত্যুর পথ। এই কথাটি আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখাউচিত। এটি একটি বড় সত্য সাহিত্যক্ষেত্রে এবং এই সত্যটি মানার দরুন বহু তরুণ আশাবাদী লেখকের ও লেখিকারক্ষমতাকে বিপথে গিয়ে পড়ে নষ্ট হতে দেখেচি। সাহিত্যেরক্ষেত্রেও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শক্তিকে ও অভিজ্ঞতাকে অর্জন করতে হয় সাধনা দ্বারা ও তপস্যা দ্বারা। তখন অন্তর্দৃষ্টিআপনিই খুলে যায়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অপরের বই পড়ে লাভকরতে হয় না—আপনি এসে আশ্রয় করে শিল্পীকে। এ যেনযোগীর তৃতীয়

নেত্র খুলবার মতো ব্যাপার। কিন্তু যতক্ষণ সেইদুর্লভ ঘটনা না ঘটবে ততক্ষণ শিল্পী যেন কারো প্রশংসারলোভে বা ধমকের ভয়ে স্বধর্ম ত্যাগ না করেন। এতে যদি তারঅদৃষ্টে হাততালি না জোটে নাই জুটবে। নায়মাত্মা বলহীনেনলভ্যঃ—আত্মসংজ্ঞাহীন ভীরুচিত্ত শিল্পী নিজের সর্বনাশ নিজেইডেকে আনেন।

লেখক ও কবির মধ্যে একটি সহজাত নিঃসঙ্গতা আছে। দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন তাঁদেরলক্ষ্য, যার জন্যে লেখকের প্রয়োজন আপনার ভাবজগতেরমধ্যে যত বেশিক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা।নিরাসক্ত আনন্দের বাদুঃখের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি। আপনাকেপ্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হন। চারিপাশের মানবহৃদয়ের অন্তরতম স্পন্দনটিকেতিনি একান্ত ভাবে অনুভবের চেষ্টা করেন বলেই তো তাদের শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মধ্যেবিশ্বমানবের কণ্ঠ বেজে ওঠে, জীবনেরমূলতম রহস্যের আবেগএকান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। বাস্তবকে বুঝতে হলেও দূর থেকেতাকে দেখতে হয়, লোকলোচনের অতি স্পষ্ট পাদপ্রদীপেরসামনে অনুক্ষণ থেকে তা সব সময় সম্ভব হয় না, এর জন্যেচাই নির্জনতা, খ্রিস্টের চল্লিশ দিনের নিঃসঙ্গ অবকাশ বুঝবারও বোঝাবার প্রয়াসে তপস্যা। সৃষ্টির আনন্দ আসে যে বিরাট অনুভূতি থেকে—যাকে বলেচেন 'আনন্দ'—"আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি সর্বাণি ভূতানি জায়ন্তে"—সে আনন্দ সহজপ্রাপ্যনয়, সে আনন্দ আপন রস আহরণ করে বিশ্বের তাবৎসৌন্দর্যরাজির মধ্যে থেকে, পুরাতন সৃষ্টির নব উদ্বোধনেরদ্বারপথে তপস্যা ভিন্ন সে জগৎ সে পথ চির অপরিচিতই থেকেযায়। একশীতের নির্জন অপরাহ্নে ছন্নছাড়া দরিদ্র সরাইখানা ও সরাইওয়ালীর দুঃখময় জীবন আলফাঁস দোদের মনে যে করুণ অনুভূতি, যেব্যথাও বেদনাবোধ জাগিয়েছিল, আমাদেরমনেওসেই জীবনের ছবিটি রেখাপাত করে গেল, কারণ—লেখকেরঅনুভূতি তাঁর তপস্যাভূমি সেই সরাইখানার প্রাঙ্গণে একটিশীতের সন্ধ্যায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এ যুগেই হোক বা সেযুগেই হোক, নিজের রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক লোক সচেতন থাকেন। কবিমানসের রসবোধ থেকে এ চেতনার উৎপত্তি।সর্বপ্রথমে তাঁর নিজের তৃপ্তির জন্যে লেখেন। প্রত্যেক মানুষেরমধ্যেই কমবেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্নদেখে, কোনো ক্ষণে আদর্শবাদের বা অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, জীবনের ধ্যানে সহসা হয় উন্মনা। রসসাহিত্যের প্রধান কথা হচ্চে এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিসাধন করা। পাঠকের কথা ওঠে তার পরে। সাংসারিক বা সামাজিকপ্রশ্ন ওঠে তার পরে।

কিন্তু সহানুভূতিসম্পন্ন শিল্পী-মানস যুগের স্পর্শ এড়িয়েচলতে পারেননা। যে সময়ে যে যুগে তিনি জন্মেছেন তারসার্বিক অভিজ্ঞতাতাঁর নিজেরও; লোকান্তরিত দেশান্তরিত ছবিআঁকবার সাধ্য তাঁর নেই। রাষ্ট্রনীতিক বা সামাজিক অভাববোধবা অভিজ্ঞতা, তাকে সুদৃঢ়ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী হতে দেয়।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এক শ্রেণীর শ্রেণীচেতনাকে আশ্রয়করে স্থির পথে অগ্রসর হচ্চে, যে শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে এইশ্রেণীচেতনা জড়িত তাদের মধ্যে লেখনী ধরবার যদি কেউ নাথাকে তবে ভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে যাদের জন্ম তাঁদের রচনায়পূর্বোক্ত শ্রেণীর বক্তব্য ফুটে উঠবে কি না তা সার্থক বা পরিপূর্ণকি না এসব মূল্যবিচার বর্তমানে করে কোনো লাভ নেই।সময়ের কষ্টিপাথরে এ সবের মূল্য নির্ধারিত হবে একদিন। তবে একটা কথা—দলের হুজুগে বা মতবাদের হুজুগে কেউযেন এ শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করতে না যান। তিনি ঠকবেন।

আত্মসমাহিত শিল্পী-মানসের অন্তর্নিহিত প্রেরণা থেকে যেসাহিত্য রচিত হয় না, তার মূল্য বড় কম। দুদিনের হাততালির পরে তা নিঃশব্দে যায় মিলিয়ে। এ দায়িত্ব তাঁর নিজের কাছে নিজের পাঠক-গোষ্ঠীকে সচেতন করবার পূর্বে তাঁকে বিচারকরে দেখতে হবে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে কতদূর সচেতন। তাঁর কবিমানস তৃপ্ত হয়েছে কিনা। আমার নিজের কাছে এইকথাটাই সবচেয়ে বড় মনে হয়, যিনি যাই নিয়েই লিখুন না কেন প্রত্যেক রসসাহিত্যিকের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে।তাঁর নিজের কাছে যা পরিস্ফুট নয়, যা তাঁর কবিমানসকে তৃপ্ত করে না, জনসাধারণের কাছে প্রশংসা পাওয়ার লোভেই হোক বা সমালোচকের ভয়েই হোক, তেমন সৃষ্টিতে তিনিকখনো হাত দেবেন না।

তার মন তখনই সক্রিয় হয়ে উঠবে, যখন তিনি বুঝবেন তাঁর সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে আশ্রয় করে এলেখা তৈরি। এই কঠিন আত্মস্বাতন্ত্রের জন্যে চাই সাহস, যা প্রত্যেক সত্যিকার সাহিত্যিকেরই আছে। সাহিত্য ও আর্টেরমস্ত বড় কাজ সমসাময়িক সমস্যার উল্লেখ করা বা সমাধানকরা, সমাজ-সচেতন হওয়া, জনগণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়েদেওয়া নবদৃষ্টিভঙ্গির আবাহন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতেহবে, তাঁদের অপর উদ্দেশ্য হচ্চে সৌন্দর্যসৃষ্টি, যা সমসাময়িকসমস্যারও অতীত। স্বধর্ম তাগ করা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেরন্যায় আর্টের ক্ষেত্রেও ভয়াবহ।

গভীর রহস্যময় এই মানবজীবন। এর সকল বাস্তবতাকে, এর বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভাব নিয়েচেনকথাশিল্পী। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে মানুষের হট্টকোলাহল যেখানে বেশি, মানুষের সঙ্গে মিশতেহবে, তাদেরসুখদুঃখকে বুঝতে হবে। যে লেখক পাশের বাড়ির প্রতিবেশীরসত্য চিত্র এঁকেচেন, তিনি সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রইএঁকেচেন। চাই মানুষকে বুঝবার সহানুভূতি ও ধৈর্য। এত বড়মন্বন্তর ঘটে গেল বাংলাদেশে অথচ চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে আমরাতার কি ছবি পেলাম ?আমরা পেলাম নায়িকার নাকেকান্না প্যানপ্যানানি গান, মিষ্টি মিষ্টি কথায় নায়কের প্রেমনিবেদনআর মান্ধাতার আমলের যাত্রার পালার ট্র্যাডিশনে কতকগুলিপৌরাণিক নাটক। অথচ যাঁরা পুরাণরচয়িতা জনগণকেবাদ দিয়ে তাঁরা চলেন নি। পুরানো দিনের গণমনের কতব্যথা-বেদনার ইতিহাস ব্যাস-বাল্মীকির অমর মহাকাব্যগুলির মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে—কত গাথা, কত কাহিনী, কত কথা। সে যুগের পটভূমিকায় রচিত কথাশিল্প হচ্চে ওগুলি, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিতহয়েছিল কত গাথা, কত কাব্য-রাজসভায় মহাকবি সেগুলিআবৃত্তি করে যেতেন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে।

এইজন্যে পুনরায় বলি সমাজ-সচেতনতা লেখকের মস্তবড় গুণ। যিনি দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতি উদাসীনথেকে সাহিত্য রচনা করেন, তিনি নিজের কবিমানসের প্রতি অবিচার করেন। জীবনবোধের দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন না, জনসাধারণের প্রতিঘাতমুখর জীবনধারা হতেবহুদূরে একটি কল্পলোক সৃষ্টি করে তিনি কল্পনাবিলাস চরিতার্থকরতে পারেন, কিন্তু সামাজিক জীবনের ওপর তার কোনোস্থায়ী ফল ফলে না।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের হতাশার কারণনেই, নবতর অশ্ববাহিনীর অশ্বক্ষুরোত্থি ধুলি দিকচক্রবালেদেখা দিয়েচে, আগেই বলেচি। আর একবার সেই আশারবাণীটি উচ্চারণ করে আমি বক্তব্য শেষ করবো। এই তরুণলেখকদের অভ্যুদয়কে আমি অভিনন্দন জানাই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করচি বঙ্গবাণীর বেদিমূলে কয়েকজনশক্তিধর নবীন পূজারীর আবির্ভাব। এতে এই প্রমাণ হল যে, বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব, যেমন তাছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল ভারতচন্দ্রেরযুগে, যেমন ছিল নববাবুবিলাস-এর ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়েরযুগে, যেমন ছিল বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের যুগে। কলালক্ষ্মীর অর্ঘ্য এঁরা নিপুণহস্তে রচনা করেছেন, এঁরা নব্য বাংলারপ্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েচেন, এঁদের লেখার মধ্যে ধ্বনিত হয়েউঠেচে সে প্রাণস্পন্দনের সুর। যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণকরেন, সে মাটি অজর, অমর। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাব্যতাকে তা নিজের মধ্যে বহন করছে।

আর একটি কথা। সাহিত্য আমাদের পরিচিত করবেনিগুঢ় বিশ্বরহস্যের সঙ্গে, জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গেদেবে আমাদের উপর মৃত্যুজয় দৃষ্টি, সকল সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বেযে অসীম অবকাশ ও তৃপ্তি, আমাদিগকে পরিচিত করবে সেইঅবকাশের সঙ্গে—এও সাহিত্যের একটা মস্ত বড় দিক।

"তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি"।

যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতম মূর্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে, দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণবৃহত্তর ভাবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি। জীবনেরদুঃখের দিনে যে সাহিত্যরসিক অচঞ্চল থাকেন, শোকেরমধ্যেও যিনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন, দারিদ্র্যের মধ্যেযিনি নিজেকে হেয় জ্ঞান করেন না,

মাথা উঁচু করে দাঁড়াবারসাহস রাখেন, সাহিত্য পাঠ তারই সার্থক। সাহিত্য শুধুরসবিলাস নয়, জীবন-সমস্যার সমাধানের গূঢ় ইঙ্গিত থাকবেযে সাহিত্যের মধ্যে, তারই মধ্যে আমরা পাবো কলালক্ষ্মীরকল্যাণতম মূর্তিটির সন্ধান।

জাত লেখক যিনি তিনি কখনো নিজের আদর্শ ত্যাগ করে পরধর্মকে আশ্রয় করেন না, একথা ঠিকই। তাঁর শিল্পীমানসযে রচনা দ্বারা তৃপ্তিলাভ করবে না, সে লেখা তিনি কখনোলিখতেই পারেন না। সাহিত্যের বিশাল ও উদারক্ষেত্রে সবশ্রেণীর লেখার স্থান আছে, সব রকম মতবাদের স্থান আছে।অমুক লেবেল আঁটা সাহিত্যই আসল সাহিত্য আর সব অপাংক্তেয়—এমন গোঁড়ামি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক।সাহিত্যিকের চাই সেই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সেই উদার সহানুভূতি, যার ফলে জীবনকে অখণ্ডরূপে তিনি বুঝতেও জানতে পারেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও সেই সহানুভূতিই তাঁরস্থাপন-ক্ষমতার মোড় ফিরিয়ে দেবে। সমাজ, দেশ, রাজনীতি সব কিছুরই রূপ সাহিত্যে ফুটে উঠবার অধিকার রাখে, যদি তা রসোত্তীর্ণ হয়।রসোত্তীর্ণতা সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি, একথাযে কোনো সাহিত্যিক জানেন, যে কোনো শিল্পী মানেন।[1]

[1]প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের মীরাট অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ।(দেশ ৫.১.১৯৪৬)